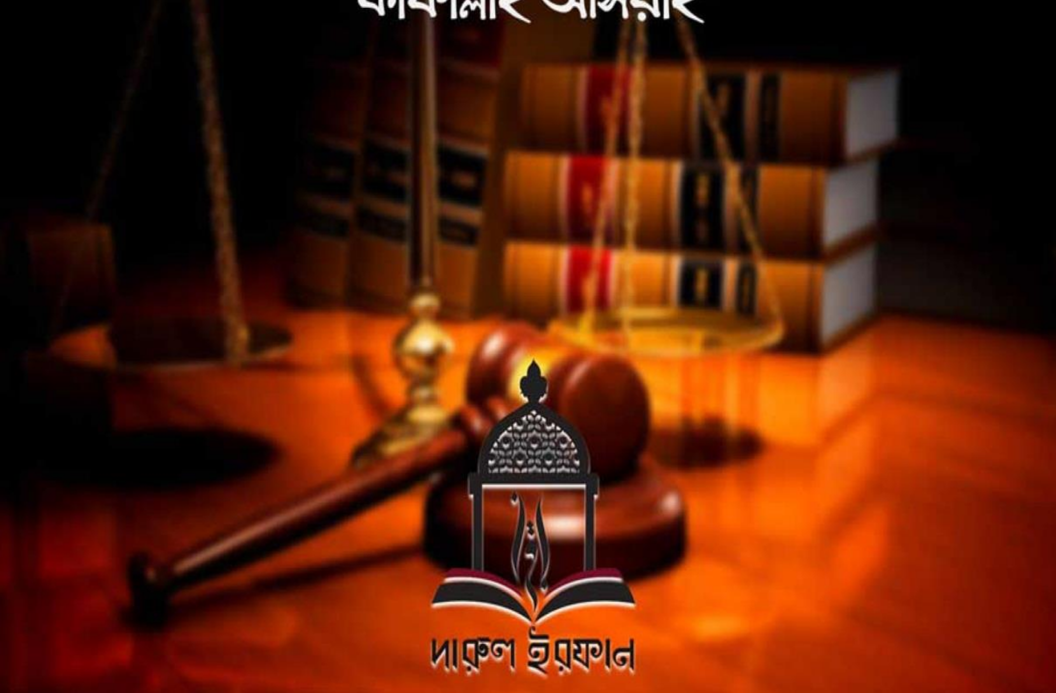
মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার

ছোট কুফর না বড় কুফর
ইবন আব্বাস (রা) -এর বক্তব্যের এর বিশদ ব্যাখ্যা

শাইখ আবু হামযা আল মিসরি
ফাকাল্লাহু আসরাহু



“মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার করা”-
ছোট কুফর না বড় কুফর?

(ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা)

শাইখ আবু হামজা আল-মিশরী

[আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন]

পরিবেশনায়

দারুল ইরফান - এর পক্ষ হতে বিতরণ সংক্রান্ত বিশেষ অনুরোধঃ

প্রকাশকের টীকাসহ এই গ্রন্থের সকল অংশে যে কোন প্রকার - যোগ-বিয়োগ, বাড়ানো - কমানো অথবা পরিবর্তন করা যাবে না, এই শর্তে, যে কোন ব্যক্তি এই প্রকাশনা প্রচার বা বিতরণ করার অধিকার রাখেন।

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি

নাম- মুস্তফা কামিল মুস্তফা। কুনিয়াত- আবু হামজা আল-মিশ্রী। জন্ম- ১৫ই এপ্রিল, ১৯৫৮। জন্মস্থান- আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর। ১৯৭৯ সনে তিনি ব্রিটেনে আসেন এবং সেখানের ব্রাইটন পলিটেকনিক-এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন। ১৯৯৭ সাল হতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর লন্ডনের ফিন্সবারী পার্ক মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। 'Supporters of Shariah' (শারী'আহ্-র সমর্থন) নামক একটি সংগঠনের তিনি নেতৃত্ব দিতেন। তার বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা অপরাধ সাজিয়ে ২০০৪ সনের মে মাসে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তীতে ৭ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। তাকে বর্তমানে ব্রিটেনের বেলমার্স কারাগারে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই মহান বীর মুজাহিদ আলেমকে ত্বরিত মুক্ত করুন।

লেখকের অন্যান্য কিছু গ্রন্থ:

- Allah's Governance on Earth
- Khawarij & Jihaad
- Beware of Takfir
- Write Your Islamic Will
- The way to bring back Shari'ah

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেছেন যা ইন্টারনেটে অডিও আকারে পাওয়া যায়।

লেখকের পক্ষ থেকে কিছু উপদেশ

দ্বীনি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু 'আলাইকুম।

আমার উপদেশ হচ্ছে নিরপেক্ষ থাকা এবং স্মরণ করা যা আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে বলেছেন, যখন তিনি সত্য অনুধাবনের জন্য আমাদের বলেছেন। তিনি নবী ﷺ ব্যতীত অন্য কোন শাইখ বা ব্যক্তির সাথে এটাকে যুক্ত করেননি। মহান আল্লাহ্ বলেন, "প্রমাণ নিয়ে আসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" তিনি কখনও বলেননি, "তোমরা শাইখ অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে আনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমরা দেখতে পাই, অনেক শাইখ এবং জ্ঞান অন্বেষণকারী তাদের সঙ্গী ভাই ও বোনদের দ্বারা ভর্ৎসনার শিকার হয়, যখন তারা অত্যাচারী শাসক ও তাদের সমর্থক আলেমগণের স্বার্থের পরিপন্থী কোন সত্যকে প্রকাশ করে থাকে।

তারা শুধু সুনির্দিষ্ট সত্য শুনতে চায় এবং তা সুনির্দিষ্ট মানুষের কাছ থেকে আসতে হবে। এটাকে বিশ্বাসের বিচ্যুতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সাধারণভাবে 'আহলে সুন্নাহ্' থেকে এবং বিশেষভাবে সত্যপথ এই বিচ্যুতি।

কতিপয় লোক আছে এমন যারা সত্য জানার পূর্বেই তাদের নির্ধারিত শাইখ অথবা তাদের অন্তরে লালিত উপাস্যদের সেই ব্যাপারে মতামত জানতে চায়। যদি আপনি বড় অথবা ছোট বিষয়ে শাইখদের সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করেন অথবা তাদের বিরুদ্ধে বলেন, তাহলে তারা আপনাকে পথভ্রষ্ট বলবে।

ইসলামে এই আচরণ হচ্ছে 'বিদআত'। সাহাবীগণ এবং 'আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত' এ ব্যাপারে একমত যে, এটা হারাম এবং এটা শিরকের পর্যায়েও যেতে পারে, যদি আপনি কোন ব্যক্তির মতামতের উপর বিশ্বাস করে মূল্যায়ন করেন এবং কুর'আন ও সুন্নাহর উপর তাকে প্রাধান্য দেন।

লোকেরা যখন এইভাবে জ্ঞান আহরণ করে অথচ তাদের শাইখ এবং তাদের জ্ঞান দ্বারা নিজের ও অন্যের জ্ঞানকে বিচার ও মূল্যায়ন করে, এটা একটি খুবই মারাত্মক ভুল।

যদিও আমরা সালফে-সালেহীনদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু শ্রদ্ধা এবং তাকলীদ (অন্ধানুসরণ) ভিন্ন বিষয়।

যদি এ ব্যাপারে আমরা বাড়াবাড়ি করি, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ আমাদের উপর প্রযুক্ত হতে পারে, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ...﴿التوبة: ٣١﴾

"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগীগণকে তাদের প্রভূরূপে গ্রহণ করেছে ...।" [সূরা তাওবাহ্ ৯:৩১]

কাজেই, আমি আমার ভাইদেরকে নসিহত করি, যাতে তারা কোন শাইখের অন্ধভক্তি বাদ দিয়ে সত্যের দিকে ধাবিত হন। ব্যক্তিকে না ভালোবেসে শাইখদের ভালকর্মকে ভালোবাসেন।

আমি মনে করি, এই ধরনের পর্যবেক্ষণ, বন্টন এবং অর্থায়নের মতো ক্ষুদ্র কাজে মুসলিম ভাইয়েরা শরীক থাকবে। ভাইদের সময় বাঁচাতে, আমরা এই গবেষণামূলক কর্ম ছোট কলেবরে প্রকাশ করেছি যাতে তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সহজে অনুধাবন করতে পারে। আর এইভাবে আমাদের প্রচেষ্টা যাতে সফল হয় এবং সকলের নিকট বোধগম্য হয়।

আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনাদের ভাই

আবু হামজা আল-মিশরী

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা কেবল তাঁর নিকট প্রার্থনা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাই।

আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমরা আমাদের আমল ও নফসের সকল খারাবি থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাই।

আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে কেউ গোমরাহ্ করতে পারে না এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক এবং একক, যার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের কথা এবং সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রদর্শিত পথ।

দ্বীনের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে বিদ'আত (দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত) প্রত্যেকটি বিদ'আতই নিয়ে যায় পথভ্রষ্টতার দিকে এবং প্রত্যেকটি পথভ্রষ্টতাই আগুনে (জাহান্নামে) যাবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿الأحزاب: ٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿الأحزاب: ٧١﴾

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তা হলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের গুণাহ্ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।"[১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿التوبة: ١١٩﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হও।"[২]

[1] সূরা আহযাবঃ আয়াত ৭০-৭১।

[2] সূরা তাওবাহ্ঃ আয়াত ১১৯।

ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর উদ্ধৃত 'কুফর[৩] দূনা কুফর[৪]' - এর ব্যাখ্যা

এই প্রবন্ধ হাকিমিয়্যাহ[৫] সম্বন্ধে কোন ব্যাপক ভিত্তিক বিশ্লেষণ নয় বরং হাকিমিয়্যাহ সম্বন্ধে গবেষণা কর্মের একটি অংশবিশেষ। যদি আপনি আল-হাকিমিয়্যাহ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চান, অনুগ্রহ করে আমাদের "Allah's Governance on Earth" নামক গ্রন্থটি দেখুন যেখানে এই বিষয়টি একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

এটা এমন কোন রচনা নয় যা মুজাহিদদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। মুজাহিদরা বিজয়ী দল। যারা শারী'আহ্ বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করছে। এ প্রবন্ধ হতে 'খাওয়ারিজ' এবং 'মুজাহিদদের মধ্যে পার্থক্য জানা যাবে না। দয়া করে এই জন্যে "Khawaarij and Jihad" নামক গ্রন্থটি দেখুন।

এ লেখাটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান সময়ের কিছু মূর্খ লোক যারা শারী'আহ্-কে ধ্বংস করার জন্য ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর এই উক্তিটির বিকৃত ব্যবহার করে এবং তারা মানব রচিত আইনের পক্ষে একে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। ইতিমধ্যেই এই খারাবি যাদের চোখে ধরা পড়েছে, তাদেরকে 'খাওয়ারিজ' বলা হচ্ছে এবং শাসকের অবাধ্য হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।

যা হোক, ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি প্রত্যাখ্যান করা ভুল হবে। এটা অনেক সচেতন ভাইয়েরা করছে। তারা ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর কথাকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া অথবা এর বৈধতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করছে।

সত্যিকারভাবে, এই বক্তব্য সঠিক, কিন্তু এটাকে ভুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। 'আহলে সুন্নাহ্'-র পথ হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার না করে সত্যের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

---

[3] কুফর অর্থ হচ্ছে অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা, অবিশ্বাস। কুফর বড় কিংবা ছোট হতে পারে। কুফরের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে।

[4] 'কুফর দুনা কুফর' কথাটি ইবন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তার সময়ের একটি ঘটনাকে কুফর বলা হয়, কিন্তু তা বড় কুফর নয় অর্থাৎ তা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না।

[5] এই বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বোচ্চ শাসক এবং তাঁর বিধান ও আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা। তিনিই একমাত্র বিধান দেবার মালিক, কেউ তাঁর বিধান পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না। এই বিধান দানে তিনি একজনকেও তাঁর শরীক করেন না।

আমরা আশা করি যে, এই ক্ষুদ্র লেখনীতে ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর কথার সঠিক অবস্থা উঠে আসবে। এটি সচেতন মুসলিমকে সত্য সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করবে।

আল্লাহ্ তাদের সহায় হোন, যারা ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর কথাকে প্রতিহত করছে এবং যারা ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর সঠিক উক্তিটি বোঝার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত দিন, যারা দুষ্টচক্রের দ্বারা এই কথার ভুল অর্থের মাধ্যমে বিপথগামী হয়েছে, যারা শারী'আহ্-র পরিবর্তে মানব রচিত আইন দাবি করছে।

ইবন আব্বাস (রাঃ)- এর কথার শাব্দিক অর্থ কী!

এবং কোন পরিস্থিতিতে তিনি এই উক্তি করেছেন?

আমাদের প্রথমেই এই বিষয়টি চিন্তা করা উচিত, 'ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর কথা কি ছিল?' এটা বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে, সেই সময়ের প্রেক্ষাপট, যখন তা বলা হয়েছিল। সেই যুগ যখন হযরত মুয়াবিয়া এবং আলী ইবন আবু তালিব (রাঃ) -এর মধ্যে মতপার্থক্য উদ্ভূত হয়েছিল।

সে সময় আলী (রাঃ) -এর শিবিরের কিছু লোক যারা পরবর্তীতে খাওয়ারিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়, তারা আলী (রাঃ) মুয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁদের দুই প্রতিনিধি এই চার সাহাবাকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাদের দাবীর সমর্থনে তারা নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে। সূরা আল-মায়িদাহ্-র ৪৪ নং আয়াত যেখানে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿المائدة: ٤٤﴾

"এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করেনা, তারাই কাফের।"[৬]

এর ভিত্তিতে খাওয়ারিজরা ঘোষণা দেয় যে, সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে শারী'আহ্ বাস্তবায়িত হয়নি, কাজেই যারা এটা বাস্তবায়নে ব্যর্থ, তারাই কাফের।

এর প্রতি উত্তরে এবং আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) -এর পক্ষাবলম্বনের জন্য ইবন আব্বাস (রাঃ) এই উক্তি করেছিলেন যে, যা ঘটেছিল তা কুফর দুনা কুফর[৭] এবং উল্লিখিত চার জন সাহাবা ইসলাম থেকে খারিজ হননি।

ঐ আয়াতের ব্যাপারে খাওয়ারিজদের বুঝটা ছিল ভুল। ইবন আব্বাস জানতেন না যে, এই সাদামাটা একটি কথা থেকে আজকের অত্যাচারী শাসক ও তাদের সমর্থকগণ এটাকে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করবে, যারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজের নিষেধ করে আর যারা শয়তানদের (ত্বাগুতদের) উৎখাত করে তাদের মুকুট চিরতরে ধ্বংস করার জন্য সংগ্রাম করে- তাদের পথে বাঁধার সৃষ্টি করবে।

এই প্রবন্ধে ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর উক্তিটি সঠিকভাবে তুলে ধরা হবে এবং সেই পরিস্থিতিকে সামনে আনা হবে। এভাবে সেইসব মানুষের কাছে বিষয়টি

---

[6] সূরা আল-মায়দাহঃ আয়াত ৪৪

[7] ছোট কুফর: যা সম্পন্নকারী কাফের হয় না।

খোলাসা করা হবে যারা এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্থ, বিভ্রান্ত এবং যারা এই যুগেও আল্লাহর শত্রুদের উৎখাতের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ গাফেল। এবার আমরা আমাদের এই বক্তব্যের দলীলের দিকে অগ্রসর হব।

শারী‘আহ্-র ‘হুকুম’-এর সাথে ‘ফতোয়া’ ও ‘রায়’-এর পার্থক্য

الفارق بين الحكم الشر عي والفتوى والقضاء

এই নাজুক পরিস্থিতিতে, আমরা কি ব্যাপারে কথা বলছি তা নিশ্চিত হতে হবে। যে কোন পরিস্থিতি বুঝতে হলে, আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, শারী‘আহ্-র হুকুম, ফতোয়া এবং রায় কি? এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার পরই কেবলমাত্র আমরা এ বিষয়গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি।

আমাদের প্রথম বিষয় হচ্ছে, শারী‘আহ্-র হুকুম। শারী‘আহ্ হচ্ছে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত হুকুম বা বিধান। আর ফতোয়া হচ্ছে একটি কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর কোন সুনির্দিষ্ট বিধানের প্রয়োগ, যার প্রেক্ষাপটের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ ‘সকল প্রকার মাদক হারাম’ এই হুকুমটি আমরা পানি বা সিরকার ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে তা সঠিক ফতোয়া হবে না। কারণ এগুলোর উপাদান হালাল। এই ফতোয়া তখনই সঠিক হবে যখন বাস্তবতা এবং শারী‘আহ্-র হুকুম হবে সঠিক ও সঙ্গতিপূর্ণ।

রায় বা সিদ্ধান্ত ফতোয়ার চেয়ে আরও বেশী স্পর্শকাতর। বিধান এটা নিশ্চিত করে যে, শারী‘আহ্-র সঠিক হুকুম সঠিক বাস্তবতায় সুস্পষ্ট এবং পরিস্থিতিটি সত্যিকার অর্থেই সংঘটিত হয়েছে এবং বিচারের সম্মুখীন হয়েছে। সঠিক রায়ের অনুসরণ করা ফরজ। এটাই হচ্ছে একজন বিচারকের কাজ। স্পষ্ট একটি বাস্তবতায় নির্দিষ্ট শারী‘আহ্-র স্থান সর্বাগ্রে এরপর ফতোয়া, সর্বশেষ ধাপ হল রায়বা ক্বদা।

সাহাবী ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর কথা প্রারম্ভে আনার কারণ হচ্ছে যে, তার কুর‘আনের আয়াত মুখস্থ ছিল। তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার ব্যাপারে জ্ঞান ছিল। তিনি তার বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে বলেছিলেন ‘কুফর দুনা কুফর’ পরবর্তীতে এই বিখ্যাত উক্তিকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন অবস্থা এবং ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

‘কুফর দুনা কুফর’ উক্তিটি ভালভাবে অনুধাবন করতে হলে, আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃত উক্তি এবং তার অর্থ যা বিভিন্ন মুফাসসিরীন ও হাদীস বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ শাইখদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত উক্তিটি হচ্ছে, “যে কুফর সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করছ, এটা আসলে সেই কুফর নয়।” এ থেকে বুঝা যায় যে এই উক্তিটি করা হয়েছিল কথোপকথনের মাঝে এই কথোপকথন সংঘটিত হয়েছিল ইবন আব্বাস ও তার সময়ের খাওয়ারেজদের সাথে।

কাজেই খাওয়ারিজদের মনে যা ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই ইবন আব্বাস (রাঃ) এই রায় দিয়েছিলেন। এটা সুনির্দিষ্টভাবে তাদের জন্য এবং ঐ সময়ের জন্য। এই

উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি এটাকে কুফর বলেছেন। সেই সাথে তিনি ঐ সময়ের বাস্তবতা এবং ঐ সময়ের নেতাদের অবস্থা বিবেচনা করেছিলেন। কাজেই সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে ঐসব লোকদের সন্দেহের উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি শারী'আহ্ -র হুকুম প্রয়োগ করেছিলেন (এবং আল্লাহ্র বিধান ছাড়া যে বিচার ফয়সালা করে সে কাফের), কিন্তু বাস্তবতা সেই ধরনের কুফরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

তার সময়ের বাস্তবতাকে আরও গভীরভাবে বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ খেয়াল রাখতে হবেঃ

১. ঐ সব লোকদের নেতারা যাকে কাফের বলেছিল তিনি জান্নাতি যা রসূল ﷺ -এর দ্বারা স্বীকৃত, অর্থাৎ আলী (রাঃ)।

২. মুয়াবিয়া (রাঃ) যাকে খলিফাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তার অন্যতম দায়িত্ব ছিল নবী ﷺ -এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐশী বাণী কুর'আনের পাণ্ডুলিপি লেখা।

৩. উভয় পক্ষের মধ্যেই শত্রুতা ছিল এবং একই সময়ে তাদের জ্ঞান ছিল ঐ সময়ের মুখ খাওয়ারিজ লোকদের থেকে বেশি। তথাপি তারা একে অপরকে 'কাফের' বলে আখ্যায়িত করেনি।

৪. শারী'আহ্ ১০০% অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তার প্রয়োগও ছিল।

কাজেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আইন ছাড়া অন্য কোন আইন প্রয়োগ হয়ে থাকে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দায়ী। এবং সেটা তার অজ্ঞতা অথবা দুর্নীতির ফসল যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কাজেই, ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর উক্তির পিছনে বাস্তবতা ছিল এবং তা তিনি তার সময়ে ফতোয়া হিসেবে তিনি দিয়েছিলেন। যারা আল্লাহর আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করে না, তাদের ব্যাপারে ইবন আব্বাস (রাঃ) আরেকটি উক্তি করেছিলেন যা 'আম' অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেই উক্তিটি নিম্নোরূপঃ

حدثنا عن حشن ابن أبي الر بيع الجر جاني قال أخبر نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عناس عن قوله تعالى و من لم يحكم بما أنزل الله فأو لنك هم الكافرون قال : كفى به كفره

হাসান ইবন আবি আর রাবিয়া আল-জুরজানি[৮] থেকে বর্ণিত, আমরা আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি মুয়াম্মার থেকে, তিনি ইবন তাউস থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "ইবন আব্বাস (রাঃ)-কে আল্লাহর এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, **"... আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।"**[৯] তিনি বলেছিলেন, "কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট।"[১০]

যখন ইবন আব্বাস (রাঃ) এই উক্তি করেছেন যে, "কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট" তখন এটাকে ছোট কুফর হিসেবে গণ্য করা যাবে না। যখন তিনি বলেছেন 'যথেষ্ট', তখন এটাকে শুধু বড় কুফর হিসেবেই ধরতে হবে। কুর'আনের আয়াতের তাফসীরের নিয়মাবলী অনুযায়ী এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা ছয়টি পয়েন্ট নিয়ে গঠিত যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলঃ

১. আহল আস্-সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আ'তের সকল মাজহাব এবং ফুক্বাহা (ইসলামী আইনজ্ঞ) এই ঐক্যমত পৌঁছেছেন যে, কোন এক সাহাবীর বা কিছু সাহাবীর বক্তব্যই কুরআনের সাধারণ আয়াতকে বাদ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এই নিয়মকে বলা হয়ঃ

لا يصلح مخصصا للقرآن

যার অর্থ হচ্ছে কুর'আনের একটি আয়াত যার ক্ষেত্র হচ্ছে 'আম' (সাধারণ) তাকে একজন সাহাবীর বক্তব্যের দ্বারা খাস (বিশেষ) ভাবে ব্যবহার করা যাবে না, যতক্ষণ না সেই ব্যাপারে ইজমা, কুর'আনের বিপরীত আয়াত, হাদীস অথবা অন্য কোন দলিল থাকে।

এই নিয়মের অর্থ এই নয় যে, ইবন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত 'কুফর দুনা কুফর' ঐ ব্যাপারে ভুল ছিল কিংবা ঐ সময়ে তার দেওয়া ফতোয়াও ভুল ছিল। না, এ ধারণা ঠিক নয়, বরং তার অর্থ হচ্ছে, তিনি এবং সাহাবীগণ ঐ সময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত ফতোয়ার অর্থ বুঝেছিলেন, যা কুর'আন অথবা সুন্নাহ্-র সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২. কুর'আন সংরক্ষণের জন্যই আমাদের আহল আস্-সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আ'তের ইজমার ভিত্তিতে তাফসীরের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। নিয়ম হচ্ছে যে,

---

8 তার নাম হচ্ছে ইবন ইয়াহইয়া ইবন জাজ। সে সত্যবাদী এবং নির্ভরযোগ্য। অবশিষ্ট বর্ণনাকারীরাও বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য।

9 সূরা আল-মায়দাহঃ আয়াত ৪৪

10 আকবার উল কাদ্দাহ, ভলিউম- ১, পৃঃ ৪০-৪৫, লেখন- ইমাম ওয়াকিয়া।

কুর‘আনের আয়াতের বর্ণনা অবশ্যই বাহ্যিক অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, যতক্ষণ না অন্য কোন দলিল থাকে যে, আমরা এটাকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে পারব। এটা খুবই কম ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

তাফসীর বিশারদগণ বলেন, "যদি এই নিয়ম সংরক্ষিত না হয়, তবে বাতিন[১১] লোকদের জন্য বিদ‘আতের দরজা খুলে যাবে। তারা কুর‘আনের ভিন্ন অর্থ নিবে এবং আহলে সুন্নাহর ঐক্যমতের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ তারা উপস্থাপন করবে।" এটা বুঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবল শব্দ অথবা আয়াতের প্রতীয়মান অর্থ নিয়েই ভাবা উচিত নয়। যদি অন্য কোন অর্থ থাকে, তবে এটা প্রমাণের জন্য স্বতন্ত্র দলিল প্রয়োজন।

উদাহরণস্বরূপ ইবন আব্বাস (রাঃ) সূরা মায়িদাহ্-র ৪৪ নং আয়াতের অর্থে এক প্রকারের কুফর বুঝেছিলেন যা তিনি একটি কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু তিনি কুফর শব্দটি পরিবর্তন করেননি। তিনি জানতেন যে, নবী ﷺ কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত আছে:

"তিন প্রকারের বিচারক আছে, যাদের দু'প্রকার জাহান্নামে যাবে এবং এক প্রকার জান্নাতে যাবে। জান্নাতি সেই যে সত্য জানে এবং সত্যের দ্বারা বিচার করে। এমন বিচারক যে তার মূর্খতা দিয়ে মানুষের মধ্যে বিচার করে সে জাহান্নামে যাবে। যে সত্য জানে কিন্তু সত্য থেকে বিমুখ, সেও জাহান্নামে যাবে।"[১২]

এই স্বতন্ত্র দলিল যা ইবন আব্বাস (রাঃ)-কে আলী ও মুয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে তাকফির করা থেকে বিরত রেখেছে। এর কারণ হচ্ছে, খাওয়ারিজরা আয়াতটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছিল, হাদীসের ভাষ্যে বিচারক ঐ সময়ে আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে আমরা দেখি, খাওয়ারিজরা নিজস্ব কারণে কিছু লোকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, পক্ষান্তরে মুজাহিদদের অবস্থান ছিল শারী‘আহ্-র পরিবর্তে মানব রচিত আইনের বিরুদ্ধে।

৩. ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রাঃ) শারী‘আহ্-র পরিবর্তনকারী লোকদেরকে কুফ্ফার বলেননি, বরং এটা ঐ সব লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যারা ঐশী বিধান বা আইন ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছে, এটিও বড় কুফর (কুফর আল-আকবার) কিন্তু শারী‘আহ্-র পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার মতো কুফরের চেয়ে ছোট।

---

[11] বাতিন লোক হচ্ছে তারা যারা বলে যে কুর'আনের বাহ্যিক অর্থ স্পষ্ট নয়, বরং আরো গোপনীয় এবং আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে। এটা যারা করে তারা হচ্ছে সুফিয়ান, শিয়া এবং বাতিনিয়া

[12] ইবন উমর কর্তৃক 'আর হাকিম' সহ চারটি গ্রন্থে বর্ণিত।

৪. আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, ইবন আব্বাস (রাঃ) এর অনেক ব্যাপারেই সাহাবাদের থেকে ভিন্ন ছিল, যেমনঃ প্রথমে তিনি নিক্কাহ আল মুতা (অস্থায়ী বিয়ে) কে হারাম মনে করতেন না, বরং এটাকে হালাল হিসেবে গণ্য করতেন, যতক্ষণ না আলী ইবন আবু তালিব (রাঃ) তাকে বলেছিলেন, "তুমি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ"।

ইবন জুবাইর (রাঃ) মন্তব্য করেন, "যদি তুমি এটাকে হালাল বলতে থাক, তবে আমি তোমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করব।" ইবন আব্বাস (রাঃ) এই ফতোয়াও দিয়েছিলেন যে, রিবা-আন নাসিয়া (পুঞ্জীভূত সুদ) হালাল, কিন্তু সব মিলিয়ে পরম্পরায় সুদ হারাম।

তিনি এও ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, ঈদে কুরবানী ওয়াজিব (আবশ্যকীয়) যখন বেশির ভাগ সাহাবীগণ এটাকে মুস্তাহাব বলতেন। এখন কোন ব্যক্তি যদি এগুলোর দিকে লক্ষ্য করে তাহলে সে দেখতে পাবে ইবন আব্বাস (রাঃ) অন্য অনেক বিষয়ে সাহাবীদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাহলে কেন 'কুফর দুনা কুফর'-এর অন্ধ অনুসারীরা তার অন্যান্য নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্ধ অনুসরণ করে না?

৫. পূর্বেকার মুফাস্‌সিরগণ (তাফসীর বিশারদ) যেমনঃ ইবন কাসীর (রহঃ), ইবন তাইমিয়া (রহঃ) এবং ইবন কাইয়েম (রহঃ), আল জাওজিয়াহ্ (রহঃ) এবং আধুনিক তাফসীর বিশারদগণ যেমনঃ আহমেদ সাকির (রহঃ), মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম (রহঃ) এর উক্তি বর্ণনা করেছেন এবং তারা ঐ সময়ের বাস্তবতা ও পরিস্থিতি জানতেন।

তাহলে কেন তারা এ বিষয়ে তাঁর থেকে দ্বিমত পোষণ করছেন এবং তাদের যুগের শারী'আহ্ পরিবর্তন করার জন্য কিছু শাসককে কাফের বলেছেন?

এই মুফাস্‌সিরগণ ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর মতামত ব্যক্ত করেননি। তারা ভিন্ন মত পোষণ করেন না, যতক্ষণ না তারা বক্তব্য ও পরিস্থিতি পুরোপুরি জানতে পারেন। অথচ তাঁদের খাওয়ারিজ না বলে কেন মুজাহিদীন বলা হচ্ছে?

যখন ইবন আব্বাস (রাঃ) এর সাথে কতিপয় সাহাবাগণের ভেড়া কুরবানীর বিষয় নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তিনি তখন কুর'আনের থেকে আয়াত উল্লেখ করেন এবং হাদিস পেশ করেন। অন্যান্য সাহাবীগণ বললেন, "আবু বকর ও ওমর কখনও এরূপ বলেন নাই অথবা এটাকে ওয়াজিব বলতেন না।" তখন তিনি তার বিখ্যাত মন্তব্য করেন,

"আমি আল্লাহ্ ও রসূল ﷺ -এর কথা বলছি আর তোমরা আবু বকর ও ওমরের কথা বলছ। তোমরা কি ভীত নও যে, আল্লাহর গজব আকাশ থেকে তোমাদের মাথায় এসে পড়বে।"

কুর'আনের হুকুম অনুসরণে যিনি এতো কঠোর, আজ তার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে কুর'আনের আয়াতের বিরুদ্ধে; এমন পরিস্থিতিতে তিনি কি খুশী থাকতেন? কখনও নয়!

৬. আমাদের বোঝা উচিত ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর অন্য আরেকটি বক্তব্যকে, "এটা আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাদের সাথে কুফর করার মতো নয়।" তার এই বক্তব্যে বোঝা যায় যে, এটা বড় কুফর হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাদের সাথে কুফরীর মতো নয়, কারণ আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করলে একজন কাফের হয়ে যায়। তাদের এই কুফর ঐ কুফর থেকে ভিন্ন যেখানে আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাদের সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়।

বড় কুফর আমরা তখনই বলতে পারি যখন এটা আল্লাহর অধিকারের সীমা অতিক্রম করে, যেমন বিধান, আনুগত্য অথবা ভালবাসা। যদি এটা মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তবে এটা ছোট কুফর।

পরিশেষে, ইবন আব্বাসের (রাঃ) বক্তব্যকে সেই জালেমদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না, যারা শারী'আহ্ পরিবর্তন করে। তাদের জন্য তরবারির আয়াত ব্যবহার করা উচিত, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[১৩]

ইমাম আহমদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেন, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أن نضرب بهذا (وأشار إللى السيف) من أمرنا رسول الله خرج عن هذا (وأشار ألى المصحف)

---

[13] সূরা তাওবাহ্ঃ আয়াত ৫

“রসূল ﷺ আমাদেরকে এটা দ্বারা তাদেরকে আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন (তিনি তরবারিকে ইঙ্গিত করলেন) যারা এটা থেকে আলাদা (তিনি কুর‘আনের দিকে ইঙ্গিত করলেন)।”[১৪]

এ কথার অর্থ পুরোপুরিভাবে তাই যা আহল আস্-সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আহ্ ঘোষণা করেছে, যেখানে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান বাদে অন্য কিছু দ্বারা বিচার করা হয়; আর এ ঘোষণা হল- শারী‘আহ্ বা বিধানের কিছু পরিবর্তন করা হচ্ছে বড় কুফর (কুফর আল-আকবর)। যদি তারা শারী‘আহ্-র বাস্তবিক প্রয়োগ করতে কিছু ব্যর্থ হয়, তবে এটাকে ধরা যেতে পারে ছোট কুফর (কুফর আল-আসগার)। আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আত বিচার বিষয়ক প্রাপ্য সমস্ত আয়াত ব্যবহার করেছে, যেখানে বিদ‘আতী লোকরা শুধু সেই আয়াত ব্যবহার করেছে যা তাদের জন্য খাপ খায়। এই ব্যাপারে একমত হলে কেউই বিধানের ব্যাপারে ইবন আব্বাস (রাঃ) অথবা অন্য কারো বক্তব্য পাবেন না যেখানে বলা হয় “এটি শির্ক, তবে ছোট শির্ক”। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“এদের কি এমন কতগুলো ইলাহ্ (বিধান দাতা) আছে যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি? ফয়সালা হয়ে না থাকলে এদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।”[১৫]

আমরা খুবই আশ্চর্য হই যে, যারা নিজেদেরকে ‘সালাফ’ দাবী করে এবং ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর ‘কুফর দুনা কুফর’ ব্যবহার করে, আর সবকিছুকে দোষারোপ করলেও তারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান বাদে বিচার ফয়সালা করাকে দোষারোপ করে না।

৭. ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর বক্তব্য সত্যায়ন করতে ইবন মাসউদ (রাঃ) -ও তাই বলেছেন, যা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাছীরে এসেছে। যখন তাকে (ইবন মাসউদ) রিসওয়া (ঘুষ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলেন, “এটা হচ্ছে সুহত (অবৈধ সম্পদ)”। তখন আবারও জিজ্ঞেস করা হয়, “না, আমরা বিচার ফয়সালার ব্যাপারে বলছি।” তিনি উত্তর দেন,

"ذاك اكفر"

---

[14] মাজমুয়া আল-ফাতাওয়া, ৩৫ নং খন্ডে ইবন তাইমিয়্যাহও একই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

[15] সূরা আশ-শুরাঃ আয়াত ২১

"এটা হচ্ছে কুফর।"[১৬]

তাফসীর ইবনে কাসীর এবং আকবার আল-ক্বাদাহ্-য় এর উল্লেখ আছে। কেন ইবন কাসীর (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাপারে মন্তব্য করেননি এবং তিনি নিজের মন্তব্য বাদে সাহাবা এবং অন্যান্যদের মন্তব্য এনেছেন? আসল ব্যাপার হল, যে দিকে মানুষ গুরুত্ব দেয় না তা হচ্ছে, ইবন কাসীর (রহঃ) একজন জ্ঞানী ফকীহ্ ছিলেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাস্তবতার কারণেই সাহাবার উদ্ধৃতির পর তারা তাদের মন্তব্য স্থান দিয়েছেন।[১৭]

ইমাম ইবন কাসীর (রহঃ) হুবহু তাই করেছেন। বিচার ফয়সালা বিষয়ক আলোচনা সূরা মায়িদাহ-র ৪৪, ৪৫ এবং ৪৭ নং আয়াত থেকেই তিনি শুরু করেননি, বরং তিনি ৪০ নং আয়াত থেকে শুরু করেছেন এবং শেষ করেছেন ৫০ নং আয়াতে গিয়ে। এগুলোর দশটি আয়াত নিম্নরূপঃ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌ই? যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন আর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"

يَٰٓأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ اللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى الْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"হে রসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়- যারা মুখে বলে, 'ঈমান এনেছি' অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে না। ইহুদীগণ মিথ্যা শ্রবণে তৎপর এবং (তাদের বন্ধু সম্প্রদায়ের) যেসব লোক কখনও তোমার কাছে

---

[16] কুফর এবং শারী'আহ্-র দ্বারা বিচার করতে অক্ষম হওয়ার বিপথগামীতার ব্যাপার বিজ্ঞ আলেমদের নিকট হতে অনেক উক্তি রয়েছে। যেহেতু আমাদের আলোচনা শুধুমাত্র ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি নিয়ে, তাই সবগুলো উক্তি অন্তর্ভূক্ত করা হল না। তবে 'Allah's Governance on Earth' নামক গ্রন্থে সবগুলো উক্তি আনা হয়েছে।

[17] সূরা মায়িদাহ্-র 88 নং আয়াত তাফসীর ইবনে কাসীর দেখুন। এবং আকবার আল ক্বাদাহ্ খন্ড- ১, পৃঃ 80-8৫ দেখুন।

আসেনি, এরা সেই অপর সম্প্রদায়টির জন্য নিজেদের কান খাঁড়া করে রাখে। শব্দগুলি যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে। তারা বলে, 'এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করবে এবং তা না দিলে বর্জন করবে।' আল্লাহ্‌ যার পথচ্যুতি চান, তার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করবার নেই। তাদের হৃদয়কে আল্লাহ্‌ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্য আছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।"

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত; তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করো। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُولَٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

"তারা তোমার উপর কিরূপ বিচারভার ন্যস্ত করবে অথচ তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত যাতে আল্লাহর আদেশ আছে? তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মু'মিন নয়।"

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَٰبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْكَٰفِرُونَ

"নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো; নবীগণ, যারা আল্লাহর অনুগত ছিল তারা ইহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আর বিধান দিত রাব্বানীগণ (রবের সাধকগণ) এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের।"

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ

“আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ এটা ক্ষমা করলে তা তারই পাপ মোচন করবে। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।”

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

“মারইয়াম তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইনজীল দিয়েছিলাম; তাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো।”

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ

“ইনজীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ এতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক।”

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবে এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শারী‘আহ্ ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তদ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন।“

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَيُوقِنُونَ

"অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ্‌ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তারা এর কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে জেনে রাখ যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্‌ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।"

أَفَحُكْمَ الْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?"[১৮]

শুধু তখনই ইবন কাসীর (রহঃ) তার সময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তার মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন, যা ছিল মোঘল আমলের কথা, যারা চেঙ্গিস খানের বিধানের দ্বারা বিচার ফয়সালা করতো। এই পরিস্থিতি আমাদের সময়েও ঘটছে। তিনি এবং আহমেদ সাকির (রহঃ) যা বলেছিলেন তা সকলেরই জানা।

সাধারণত ফক্বীহগণ কোন সিদ্ধান্ত পৌঁছানো এবং কোন বিষয়ে তার রায় প্রদানের পূর্বে সে প্রাসঙ্গিক সমস্ত আয়াত এবং ঐ আয়াতের হাদীস উল্লেখ করেন। এরপর অন্যান্য আলেমদের মন্তব্য আনেন। পরিশেষে, সমস্ত দলিল উপস্থাপনের পর ঐ বিষয়ের শেষে তার রায় ব্যক্ত করেন।

এ যাবত ইবন কাসীর (রহঃ) -এর রায় সবচেয়ে জ্ঞানগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রত্যেকটি একক সমস্যার বিশেষ দিক যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। চলুন এই সম্মানিত শাইখের বক্তব্য অধ্যয়ন করি।

"যে রাজকীয় নীতি দ্বারা তাতাররা বিচার ফয়সালা করতো, তা তাদের নেতা চেঙ্গিস খান থেকে নেওয়া হয়েছে, যে কিনা তাদের জন্য আল ইয়াসিক প্রবর্তন করেন। এটা এমন একটি আইন গ্রন্থ যেখানে বিভিন্ন শারী'আহর সমন্বয়ে বিধান তৈরি করা হয়েছে। এতে বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে। ঐ গ্রন্থে তার নিজস্ব খেয়াল খুশী ও চিন্তা ধারাও সন্নিবেশিত ছিল। এভাবেই, এটাকে অনুসরণ করে তার পুত্র বিচার-ফয়সালা করতো যে আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ্-র উপর এটাকে প্রাধান্য দিত। যে কেউ এটা করবে সে একজন কাফিরে পরিণত হবে। তার বিরুদ্ধে ততক্ষণ জিহাদ করতে হবে

[18] সূরা মায়েদাহঃ আয়াত ৪০-৫০

যতক্ষণ না সে আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর পথ অনুসরণ করে; কাজেই, তিনি বাদে অন্য কারোই অল্প কিংবা অধিক বিষয়ে বিচার করা উচিত নয়।"

ইবন কাসীর (রহঃ) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে (১৩ খন্ড) এ সম্পর্কে যা ব্যক্ত করেছেন তাও উল্লেখ করা হল,

"শেষ নবী মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর নাজিলকৃত শারী'আহ্ যে বাদ দেয় এবং বিচার-ফয়সালা করে এই শারী'আহ্ বাদে অন্য কোন বাতিল শারী'আহ্ দ্বারা, তবে সে হচ্ছে কাফের। কাজেই, তার ব্যাপারে কি হবে যে আল ইয়াসিক দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে এবং এটাকে ইসলামী শারী'আতের উপর প্রাধান্য দেয়? যে কেউই এরূপ করেছে, মুসলিমদের ইজমা অনুসারে সে ইতিমধ্যেই কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।"

এই শতাব্দী এবং বিগত শতাব্দীর ইমাম ও মুহাদ্দিস আল্লামা শাইখ আহমদ মুহাম্মদ শাকির (রহঃ) -এর বক্তব্যকে এই অংশে আনলে আরও জোরালো হবে। মিশরের এই বিখ্যাত কাজী যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা হল, "এটা কি আল্লাহর শারী'আহ্-র বৈধ যে মুসলিমদের ভূমিতে মুসলিমদের বিচার করবেন পাদ্রী, ইউরোপের ধর্ম যাজকদের বিধান দ্বারা? যেখানে তাদের, এই বিধান এসেছে মিথ্যা এবং সংমিশ্রিত মতামত হতে। তারা তাদের বিধানকে পরিবর্তন করেছে এবং তাদের নফসের ইচ্ছানুযায়ী অর্থ প্রতিস্থাপন করেছে।

না, এই বিদ'আতের উদ্ভাবক শারী'আহ্ বা এর লঙ্ঘন থেকে বেখবর। মুসলিমদেরকে এর দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি, শুধু তাঁতারদের সময় ছাড়া এবং তা ছিল খুবই খারাপ সময়। সে সময়ে অনেক হানাহানি ও জুলুম হয়েছিল এবং তখন ছিল অন্ধকার যুগ।

কাজেই এই স্বচ্ছ বিদ'আতী বিধান, যা সূর্যের মতো স্পষ্ট তা হল, আল্লাহর বিধান ছাড়া শাসন করা নিশ্চিত কুফর এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের অনুসারী কোন ব্যক্তির এই ব্যাপারে কোন প্ররোচনা বা কোন অজুহাতের সুযোগ নেই। সে যেই হোক, ইসলামের উপর তাকে আমল করতে হবে, আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং এটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"[১৯]

এই ক্ষেত্রে **আল্লামা মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম (রহঃ)**-এর বক্তব্যকে আনা যায়। তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং আরবের প্রখ্যাত মুফতি। শারী'আহ পরিবর্তন করার বিষয়ে তার বক্তব্য হচ্ছেঃ

[19] হুকুম ইল জাহেলিয়াহ্, ২৮-২৯ পৃঃ, এবং ওমদাহ তাফসীর। আয়াত ৫০, সূরা আল-মায়িদাহ।

“আসল কথা বলতে, কুফর দুনা কুফর হচ্ছে যখন বিচারক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে বিচার-ফয়সালা করে এই দৃঢ় প্রত্যয়ে যে, এটা কুফরী। সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহর বিধান হচ্ছে সত্য কিন্তু কোন এক কারণে সে তা পরিত্যাগ করেছে। এরই পরম্পরায় যে আইন তৈরি করবে এবং অন্যদেরকে এটার অনুসরণ করতে বাধ্য করবে, তখন এটা কুফর হবে। যদিও সে একথা বলে, ‘আমরা গুনাহ্ করছি এবং নাজিলকৃত বিধানের বিচার-ফয়সালা বেশি উত্তম। তা সত্ত্বেও এটা কুফর যা দ্বীন থেকে বের করে দেয়।”[২০]

শারী‘আহ্ পরিবর্তন করার বিষয়ে ঐ শাইখ অন্যত্র আরও বক্তব্য পেশ করেছেন:

আর এটি (শারী‘আহ্ পরিবর্তনের কুফর) অনেক বেশী ব্যাপক, অনেক বেশী ভয়াবহ; এটি শারী‘আহ্-র বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ঔদ্ধত্য। আর এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় যখন তারা আল্লাহর এবং তাঁর রসূলকে উপেক্ষা করে, শারী‘আহ্ কোর্টের সাথে সাদৃশ্য বজায় রেখে নতুন কোর্ট স্থাপন করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, বিকৃতির নানা প্রয়াসের অংশ হিসেবে বহু জিনিসের জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে বাতিলের ভিত্তি দাঁড় করায় ও তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করে; বিচার ফয়সালা দেয়, ফয়সালা মানতে মানুষকে বাধ্য করে এবং বাতিলের হাতে বিচারের দায়িত্ব তুলে দেয়।

শারী‘আহ্ কোর্ট যেখানে বিধান দেওয়ার জন্য আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাহর প্রতি মনোনিবেশ করে সেখানে বর্তমানে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় আইনসমূহ বিবিধ মিথ্যা ও প্রবঞ্চক শারী‘আহ্ থেকে গৃহীত আইন দিয়ে তৈরি হয়। এটা কয়েকটি আইন পদ্ধতির সমন্বয়ে তৈরী যাতে রয়েছে ফ্রেঞ্চ (ফরাসি) আইন, আমেরিকান আইন, ব্রিটিশ আইন এবং অন্যান্য আইন। প্রচলিত এই শারী‘আহ্ আরও রয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিশেষের চিন্তা ধারা, এর মাঝে কিছু হল বিদ‘আত আর বাদবাকি শারী‘আহ্ বহির্ভূত বিষয়।

এই ধরনের অনেক কোর্টই এখন ইসলামী শহরগুলোর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত।[২১] যেগুলো প্রতিষ্ঠিত এবং সুসম্পন্ন। এগুলো দরজা উন্মুক্ত এবং একের পর এক মানুষ সেখানে ভিড় জমাচ্ছে। তাদের বিচারক তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করছে যা কিনা কিতাব এবং সুন্নাহর থেকে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। ঐ মিথ্যা শারী‘আহ্-র বিচার তাদেরকে মানতে বাধ্য করা হয়। আল্লাহর শারী‘আহ্-র উপর প্রতিস্থাপন

---

[20] মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম আল-আস শাইখ এর ফাতওয়া খন্ড-১২, পৃঃ ২৮০।

[21] এই বক্তব্য ১৩৮০ হিজরিতে লেখা হয়েছে। যখন এই ধরনের কোর্টগুলো প্রথম মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন ১৪৩২ হিজরি, ২০১১ সালে এই ধরনের কোর্ট সকল মুসলমানদের ভূমিতে রয়েছে।

করে তাদের উপর এটা আরোপ করা হয়। তাহলে আর কোন কুফর এই কুফর থেকে বেশি বিস্তৃত এবং স্বচ্ছ হবে? এটা মুহাম্মদ ﷺ যে,আল্লাহর রসূল এই সাক্ষ্যের বিরোধিতা করার চেয়েও একধাপ বেশী।"[২২]

৮. ফক্বীহগণ শুধু কুর'আন ব্যতীত অন্য আইনে শাসনকারীদেরই কাফির ঘোষণা দেননি, উপরন্তু তাদের আলেমদেরও কাফির বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ্ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।"[২৩]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, "যদি কোন শাইখ কুর'আন এবং সুন্নাহ্ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং এমন বিচারকের অনুসরণ করে যে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করে না, সে তখন একজন ধর্মত্যাগী এবং কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে যে দুনিয়াতে ও আখেরাতে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।"[২৪]

৯. ইবন আব্বাস (রাঃ) আশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইবন আব্বাস (রাঃ) আল হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ আছ-ছাকাফী -এর সমসাময়িক। কাজেই আমরা

---

[22] আমাদেরকে এটার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে শাইখ এই বার্তায় যা উল্লেখ করেছেন। এই বক্তব্য মূলতঃ ১৩৮০ হিজরীতে (১৯৬০ সালে) টেলিভিশনে দেওয়া বক্তব্য হতে সংগৃহীত। এটা ছিল আগাম সতর্কবাণী। আমাদের যুগে খুবই অবহেলিত হচ্ছে। এ কারণে এই বার্তার পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন। আরবীতে লেখার ভঙ্গি এতই উচ্চসম্পন্ন যে অনুবাদ করা খুবই কঠিন। আসল আরবী রূপ হচ্ছে কবিতার আদলে। এতে আট পৃষ্ঠায় যে তথ্য ভাণ্ডারের সম্পদ উপস্থাপন করা হয়েছে তা শুধু ফাতওয়াই নয় বরং শাইখের পক্ষ হতে ওসিয়াত (শেষ উপদেশ এবং ইচ্ছা)। এটা তার জীবনের শেষ বই যা ১৩৮৯ হিজরীতে (১৯৬৯ সাল) ৭৮ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই এই শতাব্দীর একজন বড় আলেমের প্রচন্ড আক্রমণ তাগুত ব্যবস্থার প্রতি।

[23] সূরা আল-বাকারাহঃ আয়াত ১৭৪

[24] আল ফাতওয়া, ইবন তাইমিয়্যাহ খন্ড-৩৫, পৃঃ-৩৭৩।

সহজেই তা বর্ণনা করতে পারি। এখন যদি আল-হাজ্জাজ আমাদের সময়ে থাকতেন তবে তার বিরোধিতা না করা মোটেও সমীচীন হবে না, কারণ শারী'আহ্-র পূর্ণ বাস্তবায়ন করেই সে ছিল একজন মুসলিম। তিনি (মুশরিকদের বিরুদ্ধে) জিহাদ করতেন এবং উম্মাহকে অনেক সুবিধা ও সম্পদ এনে দিয়েছিলেন। তার অপরাধ হচ্ছে মিশ্র শারী'আহ্ নয় বরং তার নিজের ক্ষমতার জন্য তিনি মুসলিম এবং অমুসলিমদের হত্যা করতেন। কিন্তু বর্তমানে শাসকরা তাদের নিজেদের মিশ্র, ভ্রান্ত মানব রচিত আইনের জন্য মানুষ হত্যা করে।

১০. ইবন আব্বাস (রাঃ) আল-হুসাইনকে শক্ত উপদেশ দিয়েছিলেন ইরাক থেকে আগত বনী উমাইয়াদের সাথে যুদ্ধ না করার জন্য। আল হুসাইনের প্রতি তার উপদেশ ছিল যদি বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করতে চাইতো তবে তা ইয়েমেন থেকে আগতদের সাথেও তাই করতে হতো, ইরাক থেকে আগতদের সাথে নয়, যা ইতিহাসের অনেক বইতে বর্ণিত আছে। তথাপি আল হুসাইনকে তিনি বলেননি যে, সে একজন খাওয়ারিজ যদি সে বনী উমাইয়া অথবা আল-হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেত।

এখন অন্য আরেকটি বিষয় অবশ্যই আলোচনা করতে হবে যা আমরা ফতোয়া, হুকুম শারী'আহ্ এবং বিধানের পার্থক্যের পূর্বে আলোচনা করেছিলাম। আমাদের অবশ্যই বিধান এবং বিচার-ফয়সালার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

বিচার-ফয়সালা থেকে বিধান অনেক বিস্তৃত। বিচার ফয়সালা বিধানেরই একটি অংশ। এ কারণেই কোন বিচারক যদি আল্লাহর শারী'আহ্-র দ্বারা বিচার-ফয়সালা না করে, তখন বিধানের অন্য ধারার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে সে কি মুসলিম না কাফের? বিধান হচ্ছে আইন বিচার-ফয়সালা এবং নির্দেশের বাস্তবায়নের সমন্বয়।

যদি সাময়িকভাবে শারী'আহ্ বাদ দিয়ে সে বিচার-ফয়সালা করে, তখনও আল্লাহর বিধানই বলবৎ থাকে, তবে সেটা এক ধরনের কুফর তবে ছোট কুফর। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি বিধান অক্ষত থাকে, তখন শারী'আহ্-র আইনের বাস্তবায়ন না হলে এটা হবে কুফর দুনা কুফর। যদি বিধান পরিবর্তন হয়, তবে সেটা হবে বড় কুফর। ইবন আব্বাস (রাঃ) -কে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল বিচার-ফয়সালার ব্যাপারে, বিধানের ব্যাপারে নয়। এটা ঐ সময়ে খাওয়ারিজদের মনে ছিল না।

১১. ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর সময়ের একটি ঘটনা বলা হচ্ছে যেটার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি, শুধুমাত্র একবার ঘটেছিল। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা এমন একজনের কথা বলছি যে কিনা আল্লাহর শারী'আহ্-র পরিবর্তে অন্য শারী'আহ্ দিয়ে বিচার ফয়সালা করে, শারী'আহ্-র পরিবর্তন করে আইন তৈরী করে এবং এমন আইন করে যাতে জালেম শাসকদের সংশোধনের জন্য যারা চেষ্টা চালায়

তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যায়। এ কারণেই সাহাবাদের সময়ের আলেমরা বলতেন এটা কোন ইস্যু নয়। কারণ কারো অন্তরেই এটা ছিল না যে, কেউ গোটা শারী'আহ্ পরিবর্তন করবে।

১২. মানব রচিত সবকটি আইনই আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা-র প্রেক্ষিতে সরাসরি নেতিবাচক যা তাওহীদের একটি অংশ। মানব রচিত আইন অনুযায়ী সে ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা হয়, যে ঐ আইন মান্য করে এবং তাকে ভাল নাগরিকের শ্রেণীতে গণ্য করা হয় যদিও সে একজন পাদ্রী হয়। যতক্ষণ না কেউ মানব রচিত বিধানের সাথে সংঘর্ষ করে, ততক্ষণ তাকে ভাল নাগরিকের কাতারে শামিল করা হয়। আর বিশ্বাসীগণ - যারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দকে নিষেধ করে, তাদের দোষী, কুলাঙ্গার, জঙ্গীদের কাতারে ফেলা হয়। কিছু ক্ষেত্রে তাদেরকে ফাঁসিও দেওয়া হয়। কাজেই এটা কিভাবে সম্ভব যে, ঐ ধরনের নীতির লোকদের বাঁচাতে ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর বক্তব্যকে ব্যবহার করা হবে।

কাফের, জালেম ও ফাসেক বিচারক

এই সকল মতবিরোধের আলোকে,আমাদের জানা খুবই জরুরী যে, বিচার-ফয়সালা ব্যাপারে আমরা কোন্ ধরনের বিচারক নিয়ে কাজ করছি। শুধু তখনই আমরা সঠিক বিষয় উপস্থাপন করতে পারব এবং সে অনুযায়ী চলতে পারব। এখন আমাদের অবশ্যই কাফের, জালেম অথবা ফাসেক বিচারকের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে হবে।

১. কাফের বিচারকের উদাহরণ হচ্ছে, যখন বিচারের জন্য একজন জিনাকারী উপস্থাপন করা হয় এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে সে দোষী সাব্যস্ত হয়; কিন্তু ঐ বিচারক দোষীকে ইসলাম প্রবর্তিত শাস্তি প্রদান না করে অন্য কোন এক শাস্তি দেয় অথবা জরিমানা করে। যদি কুর'আনের আয়াত অথবা সহীহ্ হাদীসের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়, তখন ইসলামী আইন বাদে অন্য কিছু দ্বারা সে নিজেকে রক্ষা করতে চায়। জিনার শাস্তির ব্যাপারে সে বলে উঠে "এই ধরনের অপরাধের জন্য আমরা জেলে বন্দী রাখি অথবা আর্থিক জরিমানা করি"। তার ঐ কথা আল্লাহ্ তা'আলা -এর অধিকারের সীমালঙ্ঘন করা নির্দেশ করে। আর এই বিচারক হচ্ছে পুরোমাত্রায় কাফের বিচারক।

২. জালেম বিচারক এই একই অপরাধ অথবা জিনার শাস্তির ক্ষেত্রে শারী'আহ্-কে অস্বীকার করবে না অথবা শারী'আহ্ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করতে চাইবে না। কিন্তু সে কিছু লোককে এই শাস্তি প্রদান করবে না, কারণ তার সাথে তাদের সম্পর্ক ভাল, তাদের সামাজিক মর্যাদা উঁচু অথবা ঘুষ নেওয়ার জন্য তা করবে না। অর্থাৎ জালেম শাসক শারী'আহ্-কে অস্বীকার করবে না।

৩. এই একই অপরাধের ক্ষেত্রে ফাসেক বিচারক হচ্ছে যে শারী'আহ্ মোতাবেক বিচার করে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নিজের সুবিধার্থে অথবা ভয়ের কারণে সে এমন কূট-কৌশল করে, যাতে সে এটা বাস্তবায়ন করা থেকে রেহাই পেয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, এই একই অপরাধের ক্ষেত্রে ধরে নেই, চার জন সাক্ষী আছে যারা জিনার ব্যাপারে সাক্ষী দিবে। বিচারক সম্ভবত এই বলে কারণ দর্শাবে যে, এদের মধ্যে একজন ভালভাবে দেখেনি। অন্যজন রমজান মাসে পানাহার করেছে, তখন তিনি তৃতীয় জনের সাক্ষ্য দিতে বাধা দিলেন। এই ধরনের বিচারক আল্লাহর বিধানের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না। এই ধরনের পরিস্থিতি খুব কমই ঘটে।

এই হল তিন ধরনের বিচারকের সুস্পষ্ট বর্ণনা। আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, এমন কিছু বড় ফিসক এবং বড় জুলম আছে যা একজনকে ইসলামের গণ্ডী থেকে সম্পূর্ণ বের করে তাকে কাফিরে পরিণত করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

هَؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

“এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, ‘আদমের প্রতি সিজদা কর’, তখন তারা সকলেই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত; সে জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? ওরা তো তোমাদের শত্রু। জালিম এর বিনিময় কত নিকৃষ্ট।”[২৫]

এই আয়াতে শয়তান যে অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিল তা সত্যিই একটি ফিসক (অবাধ্যতার গুনাহ্) যা একজনকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কাজেই, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে শয়তান কাফের হয়ে গিয়েছিল, কারণ সে আল্লাহর আদেশ মানতে অস্বীকার করেছিল।

আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন,

يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“... হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক হচ্ছে বড় জুলুম।”[২৬]

এই আয়াতে আবারও বলা হয়েছে যে শিরক হচ্ছে বড় জুলুম। কাজেই এটা এমন এক ধরনের জুলুম যা একজনকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

---

[25] সূরা আল-কাহফ ১৮:১৫

[26] . সূরা লুকমান ৩১ঃ ১৩

কখন একজন মুসলিম খলিফার অবাধ্য হতে পারে?

খলিফার অবাধ্য হওয়া অথবা তার বিরুদ্ধে যাওয়া আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আ'হর আক্বীদাহ্ নয়, যদি না তা খুবই অত্যাবশ্যক হয়। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে খলিফার অবাধ্য না হতে, এমনকি সে যদি তোমার নির্মম সমালোচনা করে এবং তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।

"... যদি পৃথিবীতে কোন খলিফা থাকে, সে যদি তোমার নির্মম সমালোচনা করে এবং তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা সত্ত্বেও তার আনুগত্য কর, যদিও গাছের শিকড় চাবাতে চাবাতে তোমার মৃত্যু হয়।"[২৭]

যাহোক, এই হাদীসের প্রেক্ষাপট আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, এই হাদীস শুধু আপনাকে নির্মম সমালোচনার জন্য প্রযোজ্য, দ্বীনের ক্ষেত্রে নয় এবং এটা শুধু আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সকল মুসলিমের সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য নয়। হালাল হারামের বিষয় ব্যতীত নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য খলিফার বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক নয়।

তোমার এবং তোমার গোত্রের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে যদি খলিফা জুলুম করে তবে তুমি তার বিরুদ্ধাচরণ কর না বরং ধৈর্য্য ধারণ কর। কিন্তু যদি আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার খর্ব করা হয়, তবে তুমি সেই ধর্মত্যাগী খলিফার বিরুদ্ধে জিহাদ কর।

যদি আপনার শক্তি সামর্থ্য না থাকে, তবুও আপনাকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা আসহাব-উল-উখদুদ-এর ঘটনার অধিবাসীদের প্রশংসা করেছেন যাদের কোন শক্তি বা কুওয়াত ছিল না। তারা সকলে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যতক্ষণ না তাদের হত্যা করা হয়। এই সংক্রান্ত হাদীস সহীহ্ মুসলিমে আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা-এর অধিকার যা তিনি আমাদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে দিয়েছেন; সুতরাং শারী'আহ্-র ব্যাপারে প্রেক্ষাপট ব্যতীত হাদীস ব্যবহার করা উচিত নয়। তথাপি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে বিপরীত মুখী কাজ করতে আমরা দেখি। এইসব লোকগুলো হচ্ছে তারা যারা বর্তমান এই হাদীস আমাদের সম্মুখে তুলে ধরে! প্রসঙ্গত, কোথায় সেই খলিফা???

আমাদের বলা প্রয়োজন যে আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আ'হ্ -এর কত অসংখ্য ইমাম জালেম শাসকের বিরুদ্ধে গিয়েছে অথচ তাদেরকে কেউই খাওয়ারেজ বলেননি। এটাও জানা যায় যে, এই শাসকরা কুফ্‌ফারও নয়। আমরা এমন কিছু

---

[27] আবু দাউদ এবং আহমেদ কর্তৃক সংগৃহীত, হুযাইফা ইবন আল ইয়ামান কর্তৃক বর্ণিত।

ইমামের উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করব যারা শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা যুদ্ধও করেছিলেন।

১. আন-নাফস আয-যাকারিয়া যার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন হাসান ইবন হাসান ইবন আলি ইবন আবু তালিব যিনি ১৪৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছিলেন।

২. মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান। যিনি হাসান ইবন আলী (রাঃ) -কে খলিফা হিসেবে বাইয়াত দেওয়ার ৬ মাস ও ২দিন পর মতপার্থক্যের কারণে তার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন।

৩. সম্ভবতঃ সবার উপরে ইসলামী ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, আল হুসাইন (রাঃ) যিনি ইয়াজিদ ইবন মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং যাকে কারবালার প্রান্তরে হত্যা করা হয়। কেউই একবারের জন্যও হুসাইন (রাঃ)-কে খাওয়ারিজ বলেননি।

৪. আব্দুল্লাহ্ ইবন জুবাইর (রহঃ), যিনি আজ-জুবায়ের ইবন আওয়াম -এর পুত্র ছিলেন। তিনি বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং খলিফা থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, সেই সাথে মদীনার আমীরকে বাইয়াত দিয়েছিলেন। তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তিন দিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

৫. খলিফা হাদি (১৭০হিঃ)-এর সময় ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ হুসাইন ইবন আলি ইবন হাসান ইবন হাসান ইবন আলি ইবনে আবি তালেব মক্কা ও হিজাজের খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন যিনি ১৬৭হিঃ-তে ইন্তেকাল করেছিলেন।[২৮]

৬. ইমাম আবুল হাসান মূসা কাসিম ইবন জাকির আস-সাদিক ইবন মুহাম্মদ আল-বাকির খলিফা হারূন আর-রশীদ এর বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁকে আটক করা হয়েছিল যতদিন না তিনি মারা যান। তিনি ১৮৩হিঃ-তে ইন্তেকাল করেন।[২৯]

৭. ইমাম মুহাম্মদ বিন জাফর আস-সাদিক মক্কা ও হিজাজে থাকা অবস্থায় খলিফা মানুনের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছিলেন।

৮. ইমাম আলি আর রিদা ইবন মূসা কাসিম ইবন জাফর আস-সাদিক ইবন মুহাম্মদ ইবন আল-কাসিম, খলিফা মু'তাসিম-এর সময় বিদ্রোহ করেছিলেন। তাকে আটক করা হয় এবং পরাভূত করা হয়।

---

[28] তারিখ আত তাবারি, খন্ড-৬, পৃঃ-৪১০।

[29] তারিখ আল-ইয়াকুবি, খন্ড-৩, পৃঃ-১৭৫।

৯. ইব্রাহীম ইবন মূসা কাসিম ইবন জাফর আস-সাদিক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ইয়েমেনে অনেক লোককে হত্যা করেছিলেন।

১০. বর্তমান সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, শাইখ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) [১১১৬-১২০৬ হিঃ]। যিনি ওসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, যাতে জাজিরার আরবরা মূর্তি পূজা ও অন্যান্য বিদ'আত পরিত্যাগ করে।

ইতিহাসবিদ অথবা আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আ'হ্-র কোন ইমামগণই এই ধরনের বিদ্রোহকারীদের খাওয়ারিজ বলেননি এবং ঐসব শাসকদের কুফ্ফারও বলেননি। তাহলে মুজাহিদদের ক্ষত্রে কি হল? তারা সমস্ত দিক থেকেই স্পষ্ট কুফর দেখতে পাচ্ছে। আমরা এই বইতে তাদের বিরুদ্ধে অনেক দলিল ও হাদীস পেশ করেছি। এই দলিলগুলো সংখ্যায় অনেক এবং সহীহ্ আর বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যধিক। অধিকন্তু, এই ধরনের শাসকেরা বাস্তবে দখলদার।

উপসংহার

কাজেই এটা প্রমাণিত যে, শুধু তারাই নয় যারা শারী‘আহ্ পরিবর্তন করে এবং যে কেউ আল্লাহর শারী‘আহ্ দ্বারা বিচার করতে ব্যর্থ হবে সেই কুফ্ফার। আসলে শারী‘আহ্-র দ্বারা বিচার করতে ব্যর্থ হওয়াই হচ্ছে কুফর। যারা নিজেরা শারী‘আহ্ উদ্ভাবন করে, তারা কুফরের উপর কুফর (সবচেয়ে বড় কুফরের উপর বড় কুফর) করছে। যারা নিজেদের শারী‘আহ্ শক্তির দ্বারা জনগণের উপর আরোপ করতে চায় তারা সবচেয়ে বড় কুফরের চাইতেও বড় কুফর করছে।

আর যারা এই ধরনের কুফরকে জায়েজ করছে তারা সকল কুফরের সবচেয়ে বড় কুফর করছে। এবং তারা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা‘আলার দ্বীনকে বিকৃত করছে। তারা কুফর সম্পর্কে বক্তব্য দেয় এবং এটাকে হালালের আওতায় নিয়ে আসে।

তাহলে এটা স্পষ্ট যে, এই লোকেরা যারা মুসলিমদেরকে হত্যা করছে তাদের নিজেদের শারী‘আহ্-র জন্য তারা এক ধরনের খাওয়ারিজ। পূর্বের খাওয়ারিজ এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, পূর্বের খাওয়ারিজরা শারী‘আহ্ রক্ষার জন্য বিদ‘আত করতো তার এই প্রক্রিয়ায় মুসলিমদেরকে আঘাত করতো ও হত্যা করতো। কিন্তু নতুন খাওয়ারিজরা মুসলিমদেরকে হত্যা করছে এবং তারা শারী‘আহ্-কেও ধ্বংস করছে।

পূর্বের খাওয়ারিজরা নেককার হিসেবে পরিচিত ছিল এবং তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে গোঁড়া ছিল। আর বর্তমান প্রজন্মের খাওয়ারিজরা কমই ইবাদত বন্দেগী করে। খাওয়ারিজদের বর্ণনার সাথে বর্তমান প্রজন্মের শাসকদের বিস্তর মিল আছে। কারণ তারা মুসলিমদের হত্যা করে এবং কাফেরদের ছেড়ে দেয়। যেমন, বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত আছে।

যাহোক, হে প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা, কল্পনা করুন আপনি সমস্ত দলিল প্রমাণাদি জানেন এবং এমন একটি সময় উপস্থিত যেখানে ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর বক্তব্যকে বিভ্রান্তিকর ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

বাস্তবে আমরা অশ্রুসিক্ত চোখে দেখতে পাই, একজন সচেতন যুবক ভাই কিভাবে একজন শাইখের তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করার মাধ্যমে দালালার (পথভ্রষ্টতার) দিকে পরিচালিত হয়। এই শাইখরা ইবন আব্বাস (রাঃ) -এর কথা অপব্যবহার করে জনগণকে জালেম শাসকের বিরুদ্ধে চুপ থাকতে এবং তাদের শ্রদ্ধা করতে অনুপ্রাণিত করে। উল্টা তারা জনগণকে উস্কানি দেয় তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, যারা এই জালেম শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করে।

এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৯৬ সালের লন্ডনের লুটনে যেখানে সেলিম আল হিলালী তার একটি ওয়াজে ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তিটি ব্যবহার করেছিল। সেখানে তিনি মিথ্যাভাবে পেশ করেন যে, তাওহীদ আল হাকিমিয়াহ্-এর ক্ষেত্রে বড় কুফর বলে কিছু নেই।

তিনি দাবী করেন যে, ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি (কুফর দুনা কুফর) এর ব্যাপারে একটি ইজমা ছিল এবং আইনের ক্ষেত্রে কোন বড় কুফর নেই। যখন মুসলিম ভাইয়েরা তার এই বিষয়টি শুদ্ধ করার চেষ্টা করল, তখন তিনি ক্ষেপে গেলেন এবং অপমানকরভাবে দলিল পেশ করলেন এবং কোন কিছু শুনতে চাইলেন না।

তিনি সবাইকে শান্ত হতে বললেন এবং শাইখ আবু হামজা-এর সাথে বিতর্ক করা এবং মুবাহালা[৩০] করার একটি সময় ও তারিখ দেবেন বললেন। তিনি তার বক্তব্য চালিয়ে গেলেন এবং সাহাবার উক্তিকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করে বর্ণনা করলেন। সে সময়ে শ্রোতামন্ডলী পূর্ণ ছিল কিন্তু তা বেশিক্ষণ চালানো যাচ্ছিল না। শাইখ হিলালীর বক্তব্যের অনুবাদক, আবু উসামা বললেন, "আমরা একটি সময় ও তারিখে বসার জন্য প্রতিজ্ঞা করছি। আপনারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেন যদি সে না বসে।"

শাইখ আবু হামজা এবং তার সহযোগী আপ্রাণ চেষ্টা করল তাদের দুজনকে একত্রে বসাতে, যাতে বিভ্রান্তি দূর হয়।

আবু হামজা এবং তার সহযোগীরা সমস্ত আয়োজন করল এবং তারা তাদের সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ করতে লাগল। এ সমস্ত কিছুই করা হচ্ছিল, যাতে তারা তাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে। কিন্তু এর পরিবর্তে তারা তাদের ওয়াজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা বাহিরে রক্ষী নিয়োগ করল এবং শাইখ আবু হামজার সাথে তাদের তথাকথিত শাইখের সাথে কথা বলতে অনুমোদন করল না। কাজেই, শাইখ আবু হামজা ও তার সহযোগীদের কিছুই করার ছিল না, শুধু লুটন-এর ঘটনার এবং তাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার টেপ প্রকাশ করা ছাড়া।[৩১]

---

[30] মুবাহালাঃ আল্লাহর কাছে দুই পক্ষ হতে প্রার্থনা জানানো হয় যে, যারা মিথ্যা বলছে তাদের উপর যেন আল্লাহর গযব নিপতিত হয়।

[31] ঐ ক্যাসেটটি হচ্ছে "Question without Answers by Lying Hilaali"

আহ্বান

পরিশেষে আমরা প্রতিটি সৎ, সচেতন মুসলিমদেরকে অনুরোধ করব, যদি তারা জিহাদ করতে এবং জালিম শাসক ও তাদের বাহিনীদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে না পারে তবে অন্তত যারা এটা করছে তাদের পথে কাঁটা হয়ে না দাঁড়ায়। এমনকি পথভ্রষ্ট খাওয়ারিজদের মতো দল, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, ওদেরকেও পরিত্যাগ করা উচিত। এবং এ দু'ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করা ঠিক নয়।

এর কারণ খাওয়ারিজরা, যদিও তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে, তারা ইসলামের শত্রু আর জালেম শাসকেরা, যারা আল্লাহ্ তা'আলা -এর ইবাদত করে না তারাও আল্লাহর শত্রু-এই উভয় ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ করতে হবে। তাহলে তাদের কারো দ্বারাই আমরা ব্যবহৃত হব না।

শারী'আহ্ সমর্থনের জন্য আমরা বিশ্বের সমস্ত মুসলিমদের প্রতি আবারও মিনতি করছি। শারী'আহ্-র বাস্তবতা ও স্বচ্ছতার জন্য কোন শাইখ বা সাহাবার উক্তির বিকৃত ব্যবহার অনুমোদন না করার অনুরোধ করছি।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জিজ্ঞেস করবেন যে তাঁর আইন ও আদেশ আমাদের পরিবেশে বাস্তবায়নের জন্য আমরা কি করেছিলাম? যারা এই গুরু দায়িত্বপালনের চেষ্টা করেছিল কেন আমরা তাদের সাথে যোগ দেইনি? আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সিরাতুল মুসতাক্বীম-এ পরিচালিত করুন এবং এর উপর ইস্তিকামাত (দৃঢ়) থাকার তওফিক দান করুন। আমিন

রহমত ও প্রশান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী ﷺ -এর উপর। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাদের এই বই প্রকাশ করার তওফিক দান করেছেন। আমরা সকল সচেতন ভাই এবং বোনদের জন্য তাঁর রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

****

১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মে লেখা হয়েছে।

১৯৯৬ সালের শরতে সম্পাদন করা হয়েছে।